উদ্যান ফসল

ইউনিট ৮

ভূমিকা

আমাদের দেশ খাদ্যে শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও পুষ্টির চাহিদা পূরণে ফল চাষ উৎপাদনের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন প্রকার খনিজ ও ভিটামিনে সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে ফল। ফলজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে যা মানুষের কর্মসংস্থানে ও আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামাজিক কর্মকান্ডে ফল ব্যবহার হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে জন প্রতি ১১৫ থেকে ১২৫ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমরা খেতে পারছি মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম। বিদেশী ফলের আমদানি কমিয়ে আমাদের প্রচলিত অপ্রচলিত সব ধরনের ফলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আবার ফুল বা সুদৃশ্য গাছগুলো মানসিক আনন্দ দানের একটি অন্যতম উপাদান। কতগুলো ফুলে সৌন্দর্য মানুষকে চিত্তের আনন্দ দেয় আবার কতগুলো ফুলের গন্ধ খুবই মনোমুগ্ধকর। গৃহ, প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও মসজিদ প্রাঙ্গনে এ ফুল ও সুদৃশ্য গাছ শোভা বর্ধন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ফুল ও সৃদৃশ্য গাছের বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সুগন্ধিযুক্ত গাছ বা গাছের অংশবিশেষ এবং গাছ কর্তক উৎপাদিত বস্তুকে মসলা বলে। আমাদের দেশের প্রধান মসলাগুলো হলো পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, হলুদ, আদা, তেজপাতা, ধনিয়া, জিরা ইত্যাদি। ফল, ফুল ও মসলা গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এই ইউনিটে কুল, পেয়ারা, কমলা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, পিঁয়াজ, রসুন ও আদা চাষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : ফুল, ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের পরিচিতি ও গুরুত্ব
পাঠ-৮.২ : কুল চাষ
পাঠ-৮.৩ : পেয়ারা চাষ
পাঠ-৮.৪ : কমলা চাষ
পাঠ-৮.৫ : ডালিয়া ফুল চাষ
পাঠ-৮.৬ : চন্দ্রমল্লিকা ফুল চাষ
পাঠ-৮.৭ : পিঁয়াজ চাষ
পাঠ-৮.৮ : রসুন চাষ
পাঠ-৮.৯ : আদা চাষ

পাঠ-৮.১ ফুল, ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের পরিচিতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফলের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফলের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- ফুলের পরিচিতি আলোচনা করতে পারবেন;
- ফুলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- মসলার পরিচিতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী, স্বপরাগী, পরপরাগী, বর্ষজীবী, দীর্ঘজীবী, সুগন্ধি মসলা।

ফলের পরিচিতি

নিষিক্ত হওয়ার পরে ফুলের গর্ভাশয় অংশ বিশেষ পরিপুষ্ট, পরিবর্ধিত ও বিকশিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। অর্থাৎ এক কথায় নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয়ই ফল। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এগুলো প্রকৃত ফল বলে। সব সময় আবার নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয় থেকে ফল উৎপন্ন হয় না। নিষেক ছাড়া গর্ভাশয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পার্থেনোজেনিটিকভাবে বা ডিম্বক সরাসরি ফলে পরিণত হয়। এসব ফলে বীজ থাকে না। যেমন : গর্ভাশয় ছাড়াও সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জুরী ফলে রূপান্তরিত হতে পারে এগুলোকে অপ্রকৃত ফল বলে। আমরা বলতে পারি প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্বিক ফল বলে। উদ্যানতত্বের যে শাখায় ফল, নিয়ে আলোচনা করে তাকে ফল বিজ্ঞান বা পোমোলজি (Pomology) বলে।

ফলের শ্রেণীবিন্যাস

১. ফলকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল
   ১) জীবন কালের উপর ভিত্তি করে-
      ক) স্বল্পমেয়াদী ফল : কলা, পেঁপে, আনারস।
      খ) দীর্ঘমেয়াদী ফল : আম, কাঠাল, জাম, লিচু।
   ২) উৎপত্তি বা উৎস অনুসারে
      ক) প্রকৃত ফল-আম, জাম, লিচু, পেঁপে।
      খ) অপ্রকৃত ফল-আপেল, নাশপাতি, চালতা।

২. পুষ্প মঞ্জুরীর ভূমিকার উপর ভিত্তি করে-
   ক) সরল ফল-যখন একটি ফুলের একটি অথবা অনেকগুলি যুক্ত গর্ভপত্র বিশিষ্ট গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। যেমন-আম, জাম
   খ) গুচ্ছ ফল-যখন বহু যুক্তহীন গর্ভপত্র বিশিষ্ট ফুলের প্রতিটি গর্ভপত্র পৃথক ফলে পরিণত হয় যা একক ফলগুলো গুচ্ছাকারে থাকে। যেমন-আতা, শরীফা।

৩. পরাগায়নের ভিত্তিতে
   ক) স্ব-পরাগী ফল : পেয়ারা, ডুমুর, আঙ্গুর, আমলকী
   খ) পর-পরাগী ফল : আম, জাম, লিচু, পেঁপে
   গ) স্ব ও পরপরাগী ফল : কাঁঠাল, লেবু জাতীয় ফল ইত্যাদি।

জলবায়ুর চাহিদার উপর ভিত্তি করে

ক) উষ্ণ মন্ডলীয় ফল : খেজুর, অ্যাভে কেডো, কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

খ) অবউষ্ণমণ্ডলীয় ফল ঃ পেয়ারা,ডালিম, কুল, কলা, জলপাই

গ) শীতমণ্ডলীয় ফল ঃ স্ট্রবেরী, পীচ, আঙ্গুর, আপেল।

ফলের গুরুত্ব

মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না বলে সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে। খাদ্য হিসেবেই নয়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, সামাজিক কর্মকান্ডে ইত্যাদিতে ফল বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। ফল চাষের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। পুষ্টি সরবরাহে ফলের অবদান :

সব ফলেই সব ধরণের পুষ্টি উপাদান কমবেশি আছে। বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হলো ফল। কোন ফলে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান অধিক রয়েছে তা থাকে তা বর্ণনা করা হলো-

শর্করা : কিসমিস, খেজুর, আম, কলা, বেল, কাঁঠাল

চর্বি : কাজু বাদাম, অ্যাভেকেডো, বাদাম, কাঠাল বীজ ইত্যাদি।

খনিজ লবণ : খেজুর, কলা, লিচু, বেল, কাজুবাদাম

ভিটামিন : ভিটামিন এ-পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, কমলা খেজুর, ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন)-কলা, কাজুবাদাম-ভিটামিন বি-২ বেল, পেপে, লিচু, আনার ডালিম। ভিটামিন সি-আমলকী, পেয়ারা, কমলা, লেবু ও আনারস।

পানি- তরমুজ, নারিকেল, আনারস।

২। উৎপাদন বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানাজাতীয় খাদ্য শস্যের গড় ফলনে চেয়ে ফলের গড় ফলন অনেক বেশি হয় ফলে কৃষক একক জায়গা থেকে লাভবান হয়।

৩। ফল চাষে পতিত জমি ব্যবহার : অনেক পতিত জমি, বসতবাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন জমি যেখানে মাঠ ফসল জন্মানো সম্ভব হয় না এই সব জমি বা জায়গায় সঠিক ব্যবহার শুধু ফল গাছ লাগিয়ে সম্ভব।

৪। আয় বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানা জাতীয় শস্য অপেক্ষা ফলের গড় ফলন বেশি তেমনি ফলের দাম ও অনেক বেশি। ফল চাষে কৃষক খাদ্য শস্যের চেয়ে ফল চাষে অনেক বেশি আয় করতে পারে। ফল বাগানে আন্তঃশস্য যেমন-আদা, হলুদ চাষ করে বাড়তি আয় করতে পারে।

৫। ঔষধ হিসেবে ফলে অবদান : বিভিন্ন প্রকার ফল ঔষধ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন : পেটের পীড়ায় বেল ও পেপে খেতে বলা হয়। ত্রিফলা (আমলকি, হরিতকি ও বয়রা) বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফল ছাড়াও গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন: ছাল, পাতা, মুল ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬। নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ফলের অবদান

বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যের উপাদানের জন্য নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। ফলের বাণিজ্যিক নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব। দেশে ফলের রস, আচার, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি ইত্যাদির জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান করলে বিদেশ থেকে এসব আমদানি করতে হবে না। এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া বয়স্ক ফল গাছের কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি এবং ডালপালা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭। জাতীয় অর্থনীতিতে ফলের অবদান

ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বিদেশ থেকে ফল ও ফলজাত আমদানী করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। যেখানে ফল ও ফলজাত দ্রব্য বাংলাদেশে উৎপন্ন হলে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৮। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ফলের অবদান : ফল গাছ রাস্তার দুধারে মাটি ক্ষয় রোধ করে, ছায়া প্রদান করে অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের তীব্রতা কমায় ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

ফুলের পরিচিতি ও শ্রেণীবিন্যাস

উদ্যানতত্ত্ব ফসলের মধ্যে যে সব ফসল শুধু ফুলের জন্য চাষ করা হয় তাকে ফুলজাতীয় ফসল বলে। ফুল ও সুদৃশ্য গাছপালা উৎপাদনের কলাকৌশল পুস্পোদ্যান বিদ্যা বা Floriculture নামে অভিহিত। ফুল ও সুদৃশ্য গাছপালা কে মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) বর্ষজীবী (একবর্ষজীবী) এবং দীর্ঘজীবী (বহুবর্ষ জীবী)।

বর্ষজীবী ফুল : এসব জাতের ফুল কোন বিশেষ ঋতুতে বা সময়ে জন্মে এবং ফুল দেয়ার পর মরে যায় সেগুলোকে মৌসুমী ফুল বলে।

১. শীতকালীন ফুল : বাংলাদেশে মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ফুল ফুটে যেমন ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, কসমস, পপি পিটুনিয়া, লুপিন, ডায়ান্থাস।
২. গ্রীস্মকালীন ফুল : এসব ফুল মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত ফুল ফুটে যেমন: দোপাটি, বোতাম ফুল, মোরগফুল, সূর্যমুখী ইত্যাদি।
৩. বারোমাসী ফুল : সেব ফুল শীত অথবা গ্রীষ্ম যে কোন সময়ে জন্মে তাকে উভয় মৌসুমের ফুল বলে। যেমন: সূর্যমুখী, জিনিয়া ইত্যাদি। আবার লিলি জাতীয় ফুল রয়েছে যেমন: কলাবতী, দোলনচাপা, উলটচন্ডাল, ডে লিলি, অ্যাসপারাগাস ইত্যাদি।

বহুবর্ষজীবী : এসব ফুল ও সুদৃশ্য গাছ একের অধিক বছর বেঁচে থাকে। এদেরকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়।

১. লতা জাতীয় : অপরাজিতা, বাগানবিলাস, ঝুমকোলতা, মাধবীলতা।
২. ঝোপ জাতীয় গাছ : গোলাপ, বেলী, যুই, গন্ধরাজ, মল্লিকা, মুসান্ডা।
৩. বৃক্ষ জাতীয় গাছ : চাপা, নাগেশ্বর চাপা, কৃষ্ণচুড়া, বকফুল, জারুল, সোনালু, কাঞ্চন, ঝাউ, পাম, থুজা ইত্যাদি।
৪. ক্যাকটাস : বিভিন্ন ধরনের জাত ও প্রজাতি।
৫. অর্কিড : ডেন্ডোবিয়াম, এপিডেন্ড্রাম, সিমবিডিয়াম গণের অর্কিড।
৬. ফার্ণ : মেইডেন হেয়ার ফার্ণ, স্ট্যাগনট হর্ণ, হেমিওনিটিস।

আবার অনেক জলজ উদ্ভিদ রয়েছে যেমন শাপলা, পানশূল বাগানের সৌন্দর্য বর্ধন করে।

ফুলের গুরুত্ব

ফুল এর সৌন্দর্য ও সুগন্ধ মানুষের চিত্তের তৃপ্তিদানের অতি উৎকৃষ্ট উপাদান। পরিবেশ সৌন্দর্য বর্ধনে অনেক সুদৃশ্য গাছপালা বাগানে থাকলে তা সমাজের মানুষের আনন্দ দান করে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন জন্মদিনে, বিবাহে, অভ্যর্থনায়, শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, বিদায়, টেবিল ও গৃহসজ্জায় প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলদানিতে নিয়মিত টাটকা ফুল সাজিয়ে রাখা ব্যক্তির রুচিবোধের পরিচায়ক। জাপানীদের ফুলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। জাপানে পুষ্পসজ্জা শিল্প হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়া বাড়ির সামনে ও স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে ফুল বাগান জন সাধারণের মনঃ তুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। ফুল শুধু মনের আনন্দ দেয় না, ফুল থেকে মৌমাছি অমূল্য সম্পদ মধু সংগ্রহ করে। নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত ফুলের নির্যাস থেকে পারফিউম, সেন্ট, আতর ইত্যাদি তৈরি হয়। অনেক উন্নত দেশে ফুল ও সুদৃশ্য গাছের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

মসলার পরিচিতি ও গুরুত্ব

খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করার জন্য যেসব ফসল ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলোকে মসলাজাতীয় ফসল বলে। যেমন আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন, ইত্যাদি। বাংলাদেশে কমপক্ষে ২৫ ধরণের মসলা ফসলের চাষ হয়। এর মধ্যে আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ ও ধনিয়াকে প্রধান ও অন্যান্য মসলা ফসলকে অপ্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। মসলার পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ অনন্য। খাদ্যকে সুস্বাদু করা ছাড়াও খাদ্য সংরক্ষণ ও এর গুণাগুণ রক্ষার্থে ব্যাপকভাবে মসলা ব্যবহৃত হয়।

মসলার শ্রেণীবিন্যাস :

১. মসলা ঃ যেমন- মরিচ, আদা, গোলমরিচ, ধনিয়া ইত্যাদি
২. সুগন্ধি মসলা ঃ যেমন- এলাচ, তেজপাতা, জিরা, কালজিরা ইত্যাদি

মসলা ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মসলা চাষ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। মসলা চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদাম জাতকরণে অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমানে মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেট আকারে বাজারজাতকরণ হচ্ছে। সাথে সাথে বিদেশে রপ্তানি বাড়ালে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় সম্ভব হবে। আমাদের দেশে প্রতিবছর মসলা আমদানির জন্য অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। মসলা বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে, বেকারী ও প্রসাধন শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া বস্ত্রের রং, সুপানীয় ও সুগন্ধি প্রস্তুতিতে মসলা ব্যবহার হয়।

মসলা ফসলের ভেষজ গুরুত্ব

মসলার অনেক ওষুধিগুন রয়েছে। মসলা ঔষধ শিল্পেও ব্যবহার করা হয়। আদা-সর্দি কাশি, হজম শক্তি বাড়ানো ও বায়ুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হলুদ শরীরে সৌন্দর্যচর্চা, ক্ষত নিরাময় করে। রসুন-হৃদরোগ, উচ্চরক্ত চাপ, ব্যাথায় ভালো কাজ করে। জিরা-আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়, কালোজিরা-অনেক রোগে কাজ করে, পিঁয়াজ-ঠান্ডা কাশিতে চুলে ব্যবহার হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ফুল ফল ও মসলার বাগান পরিদর্শন করে পরিচিতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সারাংশ

ফল বলতে নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয়কে বুঝায়। নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয় ছাড়াও বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পার্থোনোজেনিটিকভাবে বা ডিম্বক সরাসরি ফলে পরিণত হয়। এগুলোকে অপ্রকৃত ফল বলে। প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলে। ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না তাই সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে। এছাড়া ঔষধি হিসেবে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উদ্যানতত্ত্ব ফসলের মধ্যে যেসব ফসল শুধু ফুলের জন্য চাষ করা হয় তাকে ফুলজাতীয় ফসল বলে। বর্ষজীবী ফুলকে শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন ও উভয় মৌসুমের এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। ফুল চাষের জন্য আমাদের দেশের আবহাওয়া বেশ উপযোগী তাই ফুল চাষ করে উৎপাদিত ফুল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় এবং আত্মকর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়। খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করার জন্য যেসব ফল ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে মসলা জাতীয় ফসল বলে। যেমন-আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। মসলা বিভিন্ন ধরণের ঔষধ, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে বেকারী, প্রশাধন, পানীয় ও ভেষজ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনগুলো বারোমাসী ফুল?

ক) সূর্যমুখী, জিনিয়া, কলাবতী খ) ডালিয়া, গাঁদা, কসমস

গ) দোপাটি, বোতাম ফুল, মোরগফুল ঘ) বেলী, মল্লিকা, যুই।

২। নিচের কোনটি দীর্ঘজীবী ফুল?

ক) জিনিয়া খ) লিলি

গ) চাঁপা ঘ) মোরগফুল।

৩। ফল বলতে কি বোঝায়?

ক) নিষিক্ত গর্ভাশয় খ) পরিপক্ক গর্ভাশয়

গ) পরিপক্ক পাঁপড়ি ঘ) নিষিক্ত ও পরিপক্ক গর্ভাশয়।

৪। কোনটি সরস ফল?

ক) আম খ) সুপারী

গ) কাঠবাদাম ঘ) এপ্রিকট।

৫। উষ্ণমণ্ডলীয় ফল কোনটি?

ক) স্ট্রবেরী খ) আঙ্গুর

গ) কলা ঘ) আপেল।

৬। সুগন্ধি মসলা কোনটি?

ক) মরিচ খ) এলাচ

গ) পিঁয়াজ ঘ) হলুদ

পাঠ-৮.২ কুল চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কুলের জাত সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কুলের জলবায়ু ও বংশবিস্তার বর্ণনা করতে পারবেন;
- কুলের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাউকুল, কুড়ি সংযোজন, ফল ছিদ্রকারী পোকা।

কুলকে ইংরেজিতে Ber বা Jujube বলে। বর্তমানে কুল চাষ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্ট জাত উদ্ভাবনের ফলে বাণিজ্যিকভাবে কুলের চাষ বেড়েছে। কুলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও খণিজ লবণ আছে। কুলের ফুল পেটের গ্যাস ও রুচি বর্ধকের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুল ও পাতা উভয়েই ক্ষত রোগের জন্য উপকারী। কুল কাচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া হয়। এছাড়াও আচার, চাটনি তৈরি করা যায়। বাংলাদেশে বিশেষ করে বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহে উৎকৃষ্ট জাতের চাষ হয়ে থাকে।

কুলের জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো বারি কুল-১, ২, ৩, ৪। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত জাতগুলো হল-বাউকুল-১, বাউকুল-২, বাউকুল-৩। এছাড়াও আপেল কুল, নারিকেলী কুল উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৮.২.১ : কুল

জলবায়ু ও মাটি

কুল জন্য শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন। কুল আর্দ্র আবহাওয়ায় চাষ অনুপোযোগী। উঁচু বা মাঝারি জমি, দোআশ মাটিতে কুলের চাষ ভালো হয়, তবে সব মাটিতেই চাষ করা যায়।

বংশবিস্তার

বীজ ও কলম উভয় মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা যায়। কুঁড়ি সংযোজন করে যেকোন কুল গাছকে মিষ্টি জাতে বা উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা যায়। সেজন্য কুড়ি সংযোজনই সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি। বীজের মাধ্যমে চারা গাছে মাতৃগুণ থাকে না এবং ফল আসতে সময় বেশি লাগে। সাধারণত কুলে রিং বা টি বাডিং করা হয়।

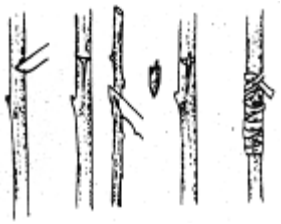

চিত্র ৮.২.২ : টি বাডিং

জমি ও গর্ত তৈরি

জমি ৪/৫ বার চাষ দিলে ভালো হয়। ৬-৭ মিটার দুরে দুরে ১মি.×১মি.×১মি. গর্ত তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ : কুলের জন্য প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি এবং ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে।

ডাল ছাটাই কারণ

প্রত্যেক বছর ফল সংগ্রহের পর ডাল ছাঁটাই করতে হবে। কারণ নতুন ডালে ফুল বেশি হয়। ফল আসার আগে সরু, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত ঘন ডাল কেটে পাতলা করে দিতে হবে। এতে করে ফল বেশি ধরে।

পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থা

ফল ছিদ্রকারী পোকা : কুলের জন্য ফলছিদ্রকারী পোকা সবচেয়ে ক্ষতিকর। শুককীট ফলে গর্ত করে এর শাস খায় এতে ফল আর খাওয়ার উপযোগী থাকে না। গাছে ফল ধরার পর সুমিথিয়ন বা ম্যালাথিয়ন ২ মি.লি হারে ১৫দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা : কীড়া ফলের ভিতর ঢুকে শাঁস খেতে থাকে এবং ফল খাওয়ার অনুপোযোগী হয়ে যায়। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ লি. ডায়াজিনন মিশিয়ে ফল পাকার আগে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

এছাড়াও ফলের মাকড়, বিছা পোকা ও কোনো কোনো সময় কুল গাছের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়।

কুলের পাউডারী মিলডিউ রোগ : এ রোগে গাছের পাতা, ফুল ও কচি ফল আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত ফুল ও ফল ঝরে পড়ে। পাতা, ফুল ও ফলের উপরে সাদা ধুসুর পাউডার দেখা যায় এবং পাতা নষ্ট হয়। বের্দো মিশ্রণ প্রয়োগ করলে এ রোগ দমন করা যায়।

ফলের পচন : এ রোগের ফলে প্রথমে হালকা বাদামি দাগ পড়ে এবং ফলকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের জন্য ডাইথেন এম ৪৫, ২ গ্রাম ঔষধি ১ লি. পানিতে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ : কলমের গাছে ২-৩ বছরের মধ্যেই ফুল আসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল আসার পর ৩-৪ মাসেই ফল পরিপক্ক হয়। ফল হালকা হলুদভাব হলে নিচে জাল পেতে ডাল ঝাঁকুনি দিয়ে সংগ্রহ করা যায়।

ফলন

গাছের বয়স ভেদে প্রতি গাছ থেকে ১৫০ কেজি ফল সংগ্রহ করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কুল চাষের উপর প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

কুল বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কুঁড়ি সংযোজন করে যেকোনো কুল গাছকে মিষ্টি জাতে বা উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা যায়। কুলের জাতগুলি বারিকুল ১, ২, ৩, ৪ বাউকুল ১, ২, ৩, আপেল কুল ও নারিকেলী কুল উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক বছর ফল সংগ্রহের পর ডাল ছাটাই করতে হবে। ফলে ছিদ্রকারী পোকা, মাছি পোকা হল কুলের ক্ষতিকর পোকা। পাউডারী মিলডিউ রোগ ও ফলের পচন রোগের কারণে কুলের ব্যপক ক্ষতি হয়। গাছের বয়স ভেদে প্রতি গাছ থেকে ১৫০ কেজি ফল সংগ্রহ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কিসের মাধ্যমে কুলকে মিষ্টি জাতে রূপান্তরিত করা যায়?
- ক) কাটিং খ) বীজের মাধ্যমে
- গ) লেয়ার গ্রাফটিং ঘ) কুড়ি সংযোজন

২। কখন কুলের ডাল ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয়?
- ক) ফল আসার সময় খ) ফুল আসার পর
- গ) ফল আসার আগে ঘ) ফল সংগ্রহের পর

৩। কোন রোগে আক্রান্ত হলে কুলের পাতায় ধুসর সাদা পাউডারের মত দেখা যায়?
- ক) পাউডারের মিলডিউ খ) এনথ্রাকনোজ
- গ) ফলের পচন ঘ) ক্যান্সার

পাঠ-৮.৩ পেয়ারার চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পেয়ারার জাত, বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- পেয়ারার জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- পেয়ারা চাষ পদ্ধতি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কাজী পেয়ারা, ভিটামিন সি, বর্দোপেষ্ট, ডাইব্যাক, ব্যাগিং।

পেয়ারা একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। পেয়ারায় প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। পেয়ারা দ্বারা জ্যাম, জেলি তৈরি হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই এই ফলের চাষ হয়ে থাকে। তবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, গাজীপুর, পার্বত্য অঞ্চলে বাণিজ্যিক চাষ হয়ে থাকে।

চিত্র ৮.৩.১ : পেয়ারা

পেয়ারা জাত : বাংলাদেশে পেয়ারার জাতগুলো হল-বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত জাত কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা-২। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাউপেয়ারা-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত জাত-ইপসা পেয়ারা। এসব জাতের পাশাপাশি অন্যান্য জাতগুলো হলো- স্বরূপকাঠি, কাঞ্চনগর, থাই পেয়ারা, মুকন্দপুরী। পেয়ারার পুষ্টিউপাদান নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

উপাদান	পরিমাণ
জলীয় অংশ (গ্রাম)	৮১.৭
মোট খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৭
হজমযোগ্য আঁশ (গ্রাম)	৫.২
খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরী)	৫১
আমিষ (গ্রাম)	০.৯
চর্বি (গ্রাম)	০.৩
শর্করা (গ্রাম)	১১.২

উপাদান	পরিমাণ
ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	১০
লৌহ (মি. গ্রাম)	১.৪
ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	১০০
ভিটামিন বি১ (মি. গ্রাম)	০.২১
ভিটামিন বি২ (মি. গ্রাম)	০.০৯
ভিটামিন সি (মি. গ্রাম)	২১০

জলবায়ু ও মাটি

যেকোনো আবহাওয়াই পেয়ারা চাষ করা যায়। তবে পেয়ারার জন্য ২৩-২৮° সে. তাপমাত্রা ভালো। অধিক বৃষ্টিপাতে পেয়ারার স্বাদ পানসে হয়। বার্ষিক ১০০ থেকে ১০২ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। ফুল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া উত্তম। পেয়ারা সব মাটিতে ভালোভাবে জন্মায় তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সুনিষ্কাশিত উর্বর জমি পেয়ারা চাষের জন্য উত্তম।

বংশবিস্তার

পেয়ারা সাধারণত বীজ ও কলম দিয়ে বংশবিস্তার করা হয়। বীজ থেকে ফল আসতে দেরি হয়। বীজের গাছে গুণগত মান

ঠিক থাকে না। তাই কলমের চারা লাগানোই উত্তম। পেয়ারার সাধারণত গুটি কলম, জোড় কলম দিয়ে চারা তৈরি করা হয়। এর মধ্যে গুটি কলমই জনপ্রিয় পদ্ধতি।

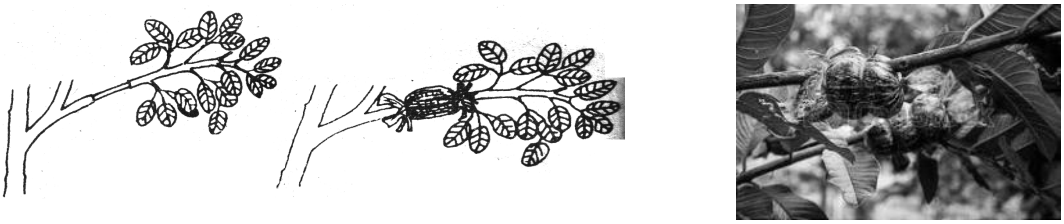

চিত্র ৮.৩.২ : পেয়ারার গুটি কলম

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমিতে কয়েকবার চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। তারপর ৫০ সে.মি.×৫০সে.মি×৫০ সে.মি আকারের এবং ৫মিটার×৫ মিটার দুরে দুরে গর্ত তৈরি করতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে ২০-২৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০ গ্রাম এমপি সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পূর্ণ বয়স্ক গাছে ১০ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া টিএসপি, এমপি ২০০ গ্রাম করে বছরে দুইবার মার্চ-এপ্রিল মাসে, বাকি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপন

পেয়ারার চারা সাধারণত মে থেকে জুলাই মাসে লাগানো ভালো। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে যেকোনো সময় লাগানো যেতে পারে। গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে চারদিকে মাটি চাপা দিতে হবে। চারার সাথে খুটি বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে।

সেচ ও আন্তঃপরিচর্যা

প্রয়োজন মাফিক ও নিয়মিত সেচ দিলে পেয়ারার ফল বড় ও ফলন ভাল হয়। মাটিতে রসের অভাব হলে ফুল-ফল ঝরে পরে। শুস্ক মৌসুমে হালকা সেচ দিতে হবে। পেয়ারা সংগ্রহের পর হালকা ছাটাই করতে হবে। গাছের গোড়া থেকে শাখা বের হয় তা ছেঁটে ফেলতে হবে। শুষ্ক, রোগাক্রান্ত ও মরা ডাল কেটে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা মাকড় দমন

রোগদমন

পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগ : ইহা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। পেয়ারার পাতা, কান্ড, শাখা ও ফল আক্রান্ত হয়। প্রথম দিকে পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট বাদামি দাগ হয় তা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলের শাঁস শক্ত হয় এবং ফল ফেটে যায়। গাছের নিচে আক্রান্ত পাতা ও ফল পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি. অনুপাতে মিশিয়ে ১৫দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

পেয়ারা ঢলে পড়া রোগ : এ রোগ হলে প্রথমে পাতা হলুদ রং ধারণ করে। গাছের আগা শুকিয়ে যায় এবং মারা যায়। এ রোগ হলে গাছ গোড়াসহ তুলে ফেলতে হবে।

ডাই ব্যাক (ডগা মরা) : গাছের কচি ডাল শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ডালে বর্দোপেষ্ট বা বর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করা যেতে পারে।

পোকা দমন : পেয়ারা গাছে মিলি বাগ আক্রমণ বেশি দেখা যায়। এ পোকা পাতা চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পেয়ারার ক্ষতিকর পোকা হল মাছি পোকা। এদের কীড়া ফল ছিদ্র করে ফলে প্রবেশ করে ফলের শাঁস খেতে থাকে। এ পোকা দমনে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা হল ব্যাগিং করা। এছাড়াও আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। ফল পাকার তিন মাস থেকে সঠিক কীটনাশক প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

ফল আহরণ

পেয়ারা গাছে বছরে দুবার ফুল আসে। মার্চ এপ্রিলে একবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আর একবার ফুল আসে। ফুল বের হওয়া

থেকে ফল আহরণের উপযুক্ত হতে সময় ৪-৫ মাস লাগে। ফল সবুজ থেকে হলদে সবুজ রং ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন

ভালো জাত, যেমন কাজী পেয়ারার বা বারি পেয়ারা ২ গড়ে ১৩০ কেজি এবং ১০০ কেজি ফলন দিতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পেয়ারার চাষবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

সারাংশ

পেয়ারা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি সুস্বাদু ফল। পেয়ারার জন্য ২৩°-২৮° সে. তাপমাত্রা উত্তম। সুনিষ্কাশিত উঁচু দোআঁশ মাটি উপযোগী। পেয়ারা সাধারণত: গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা হয়। পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ, ঢলে পড়া, ডাইব্যাক রোগে আক্রান্ত হয়। ফলের মাছি পোকা, মিলি বাগ পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ফল হলদে সবুজ রং ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পেয়ারার জন্য কত দূরে দূরে গর্ত তৈরি করতে হবে?

ক) ৫মি.×৫মি. খ) ৩মি×৩মি.
গ) ২মি.×২মি. ঘ) ১০মি.×১০মি.

২। পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ কি রোগ?

ক) ব্যাটেরিয়া জনিত রোগ খ) ছত্রাকজনিত রোগ
গ) ভাইরাসজনিত রোগ ঘ) পরজীবী জনিত রোগ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জমির ৩ বিঘা উঁচু জমিতে ধান চাষ করেছিলেন কিন্তু ধানের তেমন লাভ করতে না পারায় চিন্তায় পড়ে গেলেন। তার এক আত্মীয় তাকে উন্নত জাতের পেয়ারা চাষ করতে বললেন। কৃষি কর্মকর্তা পরামর্শ নিয়ে পেয়ারা চাষ শুরু করলেন।

৩। জমির ধানের বদলে কি চাষ শুরু করলেন?

ক) পেয়ারা খ) কাঁঠাল
গ) আলু ঘ) ধান

৪। জাকিরের পেয়ারা চাষ শুরু করলেন কেন?

i) পেয়ারার দাম বেশি ii) উঁচু জমি ধান চাষে অনুপযোগী
iii) উৎপাদন খরচ কম।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৪ কমলা চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কমলার জাত, বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কমলার জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- কমলার চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	লেবু জাতীয় কমলা, অম্লীয় মাটি, ফলের মাছি পোকা

কমলা হল লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে সারাবিশ্বে সবচেয়ে পরিচিত জনপ্রিয় ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি উৎকৃষ্ট ফল। বর্তমানে বাংলাদেশে কমলার বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু হয়েছে। বৃহত্তর সিলেট, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, পঞ্চগড় কমলা চাষের জন্য উপযোগী।

কলমার জাত

কমলার অনেক জাত রয়েছে। আমাদের দেশে জনপ্রিয় জাতগুলোর মধ্যে খাসিয়া, বারি কমলা-১, বারি কমলা-২, নাগপুরী উল্লেখযোগ্য।

কমলার চাষের উপযোগী জলবায়ু ও মাটি

কমলা যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ভালো হয় সেখানেই ভালো জন্মে। কমলা গাছ ৫৫° ফারেনহাইট থেকে ১০০ ° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় জন্মে। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, পাহাড়ী মাটি কমলা চাষ করা হয়। বিশেষ করে উর্বর পার্বত্য এলাকায় এর চাষ ভালো হয়। কমলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বৃষ্টিপাত হলে পোকার আক্রমণ বেড়ে যায় এবং ফলের ক্ষতি হয়। অম্লীয় মাটিতে কমলা ভালো হয়।

চিত্র ৮.৩.১ : কমলা গাছ

বংশবিস্তার

কমলা বীজ এবং কলম দুই পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করতে পারে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করলে মাতৃগাছের গুণাগুন ঠিক থাকে না, ফল আসতে বিলম্ব হয়। গুটি কলম, জোড় কলম ও চোখ কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করলে মাতৃগাছের গুণাগুন ঠিক থাকে এবং ফল তাড়াতাড়ি আসে।

জমি তৈরি

জমি তৈরির আগে আগাছা জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত কলমের চারা রোপনের উপযুক্ত সময়। তবে অন্যান্য সময় চারা রোপন করতে চাইলে সেচের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কমলার জন্য ৬ মি.×৬ মি. দুরত্বে রোপন করা ভালো। চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্ত করে নিতে হবে।

সারব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক বয়সভেদে কমলা গাছে সারের গাছ প্রতি মাত্রা হলো-

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১২-১৫	২০০	১০০	১৫০
৩-৪ বছর	১৫-১৮	৩০০	১৫০	২০০
৫-১০ বছর	২০-৩০	৫০০	৪০০	৩০০
১০ বছরের বেশি	৩৫-৫০	৬৫০	৫০০	৫০০

উৎস : বিএআরআই, ২০১০।

মাটির উর্বরতা ও অবস্থার উপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।

চারা রোপন

গর্তের ঠিক মাঝখানে এক বছর বয়সের চারা রোপন করতে হবে। চারা গাছ ভালোভাবে বসিয়ে দিতে হবে। তবে চারা লাগানো আগে গর্ত প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবর সার মাটির সাথে মিশিয়ে ভরাট করে ফেলতে হবে। উপরের মাটির সাথে ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি সার ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারার গোড়ার মাটি উঁচু করে দিয়ে খুটি বেধে দিতে হবে। আবার গরু-ছাগল, বন্য পশুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খাচা দিয়ে বেড়া দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

গাছের মরা রোগাক্রান্ত ডাল ছেঁটে ফেলতে হবে। গাছে অতিরিক্ত ফল আসলে কিছু ফল ফেলে দেওয়া ভালো। বর্ষা আসার পরে ফল আহরণের পর পরই মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল পালা ছেঁটে দিতে হবে। এতে ফল বড় এবং বেশি হয়।

সেচ

খরা বা শীত মৌসুমে সেচ দিতে হয়। তবে ৩-৫ বার সেচ দেয়া উচিত। বর্ষাকালে পানি না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শীতকালে ১৫-২০ দিন পর পর হালকা সেচ দিতে হবে।

রোগ দমন

লেবু জাতীয় ফলের ডাইব্যাক রোগ একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগে গাছের অগ্রভাগের ডাল মারা যেতে থাকে এবং আস্তে আস্তে গাছ মারা যায়। রোগ দেখামাত্র ১০-১৫ দিন পর পর বোর্দোমিশ্রণ স্প্রে করলে এ রোগ দমন হয়। ক্যাঙ্কার রোগে পাতা, ফল ঝরে যায়। বোর্দোমিক্সার প্রয়োগে বা আক্রান্ত অংশ কেটে রোগ দমন করা যায়। সাইলিড নামক পোকা গ্রীনিং রোগ বহন করে। এ রোগে আক্রান্ত হলে গাছের পাতা হলদে হয়। পাতা পাতলা কোকড়ানো ও ছোট হয়। গাছ মারা যেতে থাকে এবং ফল ধারণ ক্ষমতা থাকে না।

পোকামাকড় দমন

পাতা ছিদ্রকারী পোকা কচি পাতার নিচে আক্রমণ করে ফলে পাতা কুকড়ে যায়। এ পোকা দমনে মেটাসিসটক্স ১০ মি.লি./১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করা হয়। কান্ড ছিদ্রকারী পোকা ডাল বা কান্ড খেয়ে শুকিয়ে মারা যায়। রিপকর্ড ১০মি.লি/১০লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফলের মাছি পোকার কীড়া ফলের ভিতরে খেয়ে ফল ছিদ্র করে বের হয়ে আসে এবং ফল নষ্ট হয়ে ঝড়ে পড়ে। এ পোকার জন্য অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

কমলা সংগ্রহ

কমলা গাছে প্রথমের দিকে ফল কম হয় তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ফলন বেড়ে যায় এবং ফল বড় হয়। কমলা নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে পাকা শুরু হয়। ফলগুলো পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করা উচিত। কমলা সংগ্রহের কয়েকদিনের মধ্যে হলুদ রং ধারণ করে।

ফলন

কমলা হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২৫-৩০ মেট্রিক টন। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সেচের সুবিধা থাকলে ফলন বাড়ানো সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	কমলার জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির কৌশল বর্ণনা করবেন।

সারাংশ

কমলা একটি জনপ্রিয় ফল। কমলা বীজ ও কলম দু পদ্ধতিতেই বংশবিস্তার করে। গুটি কলম, জোড় কলম ও চোখ কলমের মাধ্যমে চারার তৈরি করা হয়। কমলা পাহাড়ী অঞ্চলে ভালো চাষ হয় কমলা ৬মি.×৬মি. দূরত্বে রোপণে করা উচিত। কমলায় ডাই ব্যাক ও ক্যাঙ্কার রোগ হয়। ফলের মাছি পোকা ফল ছিদ্র করে এবং নষ্ট করে। কমলার গড় ফলন প্রতি হেক্টরের ২৫-৩০ টন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কমলা চাষের জন্য কি ধরণের মাটি উপযোগী?
ক) ক্ষারীয় খ) অম্লীয়
গ) লবণাক্ত ঘ) কোনটিই নয়

২। কমলা সাধারণত: কোন মাসে পাকা শুরু হয়?
ক) নভেম্বর-ডিসেম্বর খ) ফেব্রুয়ারি-মার্চ
গ) মার্চ-এপ্রিল ঘ) মে-জুন

৩। কমলার গড় ফলন কত?
ক) প্রতি হেক্টরে ১০-১৫ টন খ) প্রতি হেক্টরে ২৫-৩০ টন
গ) প্রতি হেক্টরে ৫-১০ টন ঘ) প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ টন।

পাঠ-৮.৫ ডালিয়া ফুল চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ডালিয়ার জাত, বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ডালিয়ার জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ডালিয়ার চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শীতকালীন মৌসুমি ফুল, কন্দমুল , শাখা কলম, স্টপিং, থিনিং, টাইমিং, ডিজবাডিং

ডালিয়া বিভিন্ন রং, সুন্দর এবং আকারের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি শীতকালীন মৌসুমি ফুল। বাগান, টবে, বর্ডার প্লান্ট হিসেবে বাসগৃহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাস্তার শোভাবর্ধনের জন্য এই ফুলের চাষ করা হয়। এর আকর্ষণীয় আকার, বর্ণ বৈচিত্র্যের জন্য এর বাণিজ্যিক ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। ফুল এর উৎপত্তিস্থল মেক্সিকো সুইডেনের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আন্দ্রের ডাল এর নাম অনুসারে এর নাম ডালিয়া হয়েছে।

ডালিয়া জাত

ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল সোসাইটি ডালিয়া জাতগুলোকে ১০টি শ্রেণিতে ভাগ করেছে সেগুলো হলো:

১। সিঙ্গেল ফ্লাওয়ার্ড : যেমন- ককেট, ফ্রামে

২। এনিমোন ফ্লাওয়ার্ড : যেমন-কমেট

৩। কোলারেট : যেমন-লেডি ফ্রেন্ড, স্টারলেট কুইন

৪। পিউনি ফ্লাওয়ার্ড : যেমন-বিশপ অব ল্যান্ডডাফ

৫। ডেকোরেডিভ : যেমন-পিটার র‍্যামসে, লিবারেটর

৬। বল : যেমন-এ্যালটামি, রিস্কা মাইনার

৭। পম্পন : যেমন-অ্যাসকগ, জীনলিস্টার

৮। ক্যাটটাস: যেমন-এ্যালবার্ট, আরবকুইন

৯। সেমিক্যাকটাস : যেমন-আলফ্রেড সি

১০। বিবিধ : যেমন-পিঙ্ক গ্রাফি

চিত্র ৮.৫.১ : ডালিয়া ফুল

মাটি ও জলবায়ু

প্রচুর সূর্যালোক সম্পন্ন ঠান্ডা আবহাওয়া ডালিয়া চাষের জন্য উপযোগী। উর্বর ও সুনিষ্কাশিত দোঁআশ মাটি উত্তম।

বংশ বিস্তার

সাধারণত অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে চারা তৈরি করা হয়। কন্দমুল ও শাখা কলম থেকে চারা করা হয়। শুধুমাত্র সিঙ্গেল জাতের ক্ষেত্রে বীজ থেকে চারা করা যেতে পারে। কন্দমুলকে সরাসরি টবে বা জামিতে রোপন করা যায়। কন্দমুল কে টুকরো করেও রোপন করা যায় তবে প্রতিটি টুকরোতে একটি চোখ থাকতে হবে। আবার কন্দুমলের প্রতিটি চোখ থেকে অনেকগুলো চারা বের হয় সেগুলোকে কেটে আলাদা করে টবে বা জমিতে রোপন করা যায়।

শাখা কলম : কন্দমুল থেকে গাছ জন্মালে দুই তিনটি পাতাসহ ৭-৮ সে.মি. কেটে মে থেকে জুন মাসে শাখা কলম করে চারা রোপন করা যায়।

মাটি বা জমি তৈরি

ডালিয়া ফুল বেড ও টবে দুইভাবে চাষ করা যায়। জমি ভালোভাবে চাষ করে মাটি ঝুর ঝুরে করে নিতে হবে। মৃত্তিকা বাহিত রোগ জীবাণু থেকে রক্ষার জন্য মাটি শোধন করে নিতে হবে।

চারা লাগানো

সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা লাগানো হয়। জাতের উপর ভিত্তি করে চারা থেকে চারা ৪০-১০০ সে.মি. সারি থেকে সারি ৭০-১০০ সে.মি. দূরত্বে চারা লাগানো উচিত।

সার প্রয়োগ

ফুলের কাঙ্ক্ষিত আকার হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সার দেয়া প্রয়োজন। প্রতি শতকের গোবর সার ২০ কেজি, টিএসপি ১ কেজি, এমপি ৫০০ গ্রাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। পটাশ ও ফসফরাস এবং অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া ৩৫-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। তবে ইউরিয়া মাঝে মাঝে পাতায় স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

আন্তঃ পরিচর্যা

পানি সেচ বা অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের জন্য নালা তৈরি করতে দিতে হবে। ডালিয়া কান্ড নরম এবং এর ফুল বড় বলে গাছ যেন হেলে না পড়ে বা বাতাসে ভেঙ্গে না যায় সেজন্য শক্ত করে খুঁটি বেঁধে দিতে হয়। তিন দিকে ৩টি খুঁটি ত্রিভুজের মতো পুতে দিলে গাছ সোজা হয়ে বেড়ে উঠে।

সেচ

ডালিয়া গাছের জন্য পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে। ফুল ফোটা পর্যন্ত নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে।

স্টপিং, থিনিং এন্ড টাইমিং

চারার ডগা কেটে পাশ থেকে শাখা বের হয় তাকে স্টপিং বলে। স্টপিং এর মাধ্যমে একাধিক শাখা তৈরি করে অনেকগুলি ফুল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা রেখে বাকিগুলোকে কেটে ফেলাকে থিনিং বলে। টাইমিং হলো প্রয়োজনে বা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ফুল ফোটানোর সময় নিয়ন্ত্রণকে টাইমিং বলে।

ডিসবাডিং

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে গাছের ফুল সীমিত বা বড় আকারের জন্য কেন্দ্রীয় বা কয়েকটি কুঁড়ি রেখে বাকি সব কুঁড়ি বাদ দেয়াকে ডিসবাডিং বলে।

রোগ ও পোকা মাকড় দমন

রোগ দমন পাউডারি মিলডিউ রোগ হলে পাতায় সাদা পাউডারের মত দেখা যায়। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ০.১% বেভিস্টিল স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়। এছাড়া ও ঢলে পড়া, ড্যাম্পিং অফ, কান্ড পচা রোগ দেখা যায়। এসব ছত্রাক বাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য চারা লাগানোর পূর্বে মাটি শোধন করে নেয়া উচিত।

পোকা মাকড় দমন

ডালিয়া গাছে জাবপোকা আক্রমণ করলে পাতা, কুড়ি ও ফুলের রস চুষে নিয়ে উৎপাদন হ্রাস করে। এর সাথে সাথে ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে। ম্যালাথিয়ন, বাসুডিন মাত্রা অনুযায়ী স্পে করতে হবে। মাকড় পাতার রস চুষে খেয়ে পাতা বাদামী রং হয় এবং পাতা শুকিয়ে যায়। এক্ষেত্রে মেটাসিস্টক্স বা কেলথেন স্প্রে করা যেতে পারে।

ফুল সংগ্রহ

খুব সকালে বা সন্ধ্যার দিকে ধারালো ছুরি দ্বারা ফুল সম্পূর্ণ ফোটার আগেই সংগ্রহ করতে হবে। সাথে সাথে অর্ধেক পানিতে ভরা পাত্রে ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে। গাছটি কেটে না ফেলে আরও কিছুদিন রাখলে আবার ডাল বের হয়ে ফুল আসবে।

কন্দমুল তোলা ও সংরক্ষণ

ফুল ফোঁটা শেষ হলে গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করলে ১৫-২০ সে.মি. রেখে গাছটি কেটে দিতে হবে। এরপর কন্দ মুলগুলো উঠিয়ে নিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে শুকানো বালির মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে। ডালিয়ার মুল ৪°-৭° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে ভালো থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ডালিয়া চাষ পাদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে বর্ণনা করবেন।

সারাংশ

ডালিয়ার রং আকারের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি শীতকালীন মৌসুমি ফুল টবে, গৃহে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণের শোভা বর্ধনের জন্য চাষ হয়ে থাকে। ডালিয়া বিভিন্ন জাতের হয়ে থাকে। বংশবিস্তার সাধারণত কন্দমুলের মাধ্যমে অথবা শাখা কলমের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সময়মত স্টপিং, টাইমিং ও থিনিং করা প্রয়োজন। ফুল বড় করার জন্য ডিজবাডিং করা হয়ে থাকে। ফুল ফোটা শেষ হলে কন্দমুল তুলে সংরক্ষণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ডালিয়া সাধারণত কী থেকে চারা করা হয়?
- ক) কন্দমুল
- খ) মুল
- গ) পাতা
- ঘ) বীজ

২। কিসের মাধ্যমে অনেক ফুল পাওয়া যায়?
- ক) স্টপিং
- খ) টাইপিং
- গ) থিনিং
- ঘ) ডিসবাডিং

৩। ডালিয়া সাধারণত কোন মাসে লাগানো হয়?
- ক) মে-জুন মাসে
- খ) এপ্রিল-মে
- গ) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
- ঘ) ফেব্রুয়ারি-মাচ

পাঠ-৮.৬ চন্দ্রমল্লিকা ফুল চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চন্দ্রমল্লিকার জাত, বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- চন্দ্রমল্লিকার জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- চন্দ্রমল্লিকার চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	চন্দ্রমল্লিকা, কাটফ্লাওয়ার, সাকার, কুঁড়ি অপসারণ

চন্দ্রমল্লিকা শীতকালীন মৌসুমী ফুল। চীন ও জাপান চন্দ্রমল্লিকার উৎপত্তিস্থল। এটি জাপানের জাতীয় ফুল। চন্দ্রমল্লিকা বিশ্বব্যাপি অত্যন্ত জনপ্রিয় যা গোলাপের পরই এর স্থান। নানা আকার, বাহারি রং, আকার আকৃতি এবং ফুলের দীর্ঘস্থায়িত্ব এর কারণে সকল মৌসুমি ফুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এই ফুল টবে, উদ্যানে, বিশেষ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। শরৎকালীন ফুল ফোটে বলে শরতের রাণী বা Autmn queen বলা হয়। চীন, জাপান ইউরোপের এ এই ফুলের আরও উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কাজ চলছে। সংকরায়নের মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক জাত উদ্ভাবন হচ্ছে। শুধু বাগানের সৌন্দর্য নয় কাটফ্লাওয়ার হিসেবে বাংলাদেশের চন্দ্রমল্লিকার চাষের প্রসার বাড়ছে।

চিত্র ৮.৬.১ : চন্দ্রমল্লিকা ফুল

চন্দ্রমল্লিকার জাত

চন্দ্রমল্লিকা জাতভেদে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। (১) সিঙ্গেল (২) এনিমোন-ফ্লাওয়ার্ড (৩) ডেকোরেটিভ (৪) পমপন (৫) ইনকার্ভড (৬) কাসকেড (৭) হেয়ারি বা স্পাইডারী (৮) রিফ্লেক্সড (৯) লার্জ একজিবিশন (১০) স্পুন (১১) লিলিপুট। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত বারি চন্দ্রমল্লিকা-১, বারি চন্দ্রমল্লিকা-২।

জলবায়ু ও মাটি

চন্দ্রমল্লিকা সাধারণত : ঠান্ডা ও রৌদ্রজ্জল পরিবেশ পছন্দ করে। দোআঁশ ও পলিদোআঁশ মাটি চন্দ্রমল্লিকা চাষের জন্য উপযোগী।

চারা উৎপাদন

চন্দ্রমল্লিকা চারা বীজ, সাকার ও শাখা কলম হতে প্রস্তুত করা হয়। বীজ থেকে উৎপন্ন চারা থেকে ভালোমানের ফুল পাওয়া যায়না আবার ফুল আসতে সময় লাগে। সেদিক থেকে কলম করে চারা উৎপাদন করাই উত্তম।

১। সাকার থেকে চারা উৎপাদন : গাছে ফুল ধরা শেষ হলে ১৫-২৫ সে.মি. উপরে ডালগুলো কেটে দিতে হয়। মাস খানেকের মধ্যে গাছের গোড়া থেকে সাকার বের হয়। এগুলো গাছের গোড়া থেকে ছিঁড়ে নিয়ে প্রতিটি খন্ডে ২-৩ টি পাতা রেখে প্রথমে ছোট টবে লাগাতে হবে। টবে মাটির মিশ্রনে সমপরিমাণ পচা গোবর সার কিংবা পাতা পচা সার এবং বালি মিশিয়ে নিতে হবে। পরিমাণ মতো পানি সেচ দিলে এক মাসের মধ্যে সাকারের খন্ডগুলো থেকে মুল গজাবে। মধ্য জুন-মধ্য জুলাই মাস পর্যন্ত খন্ডগুলো বড় হবে এবং পাশ দিয়ে শাখা বের হবে সেগুলোকে কেটে নিয়ে টবে বা বীজতলয়ে ৩০ সে.মি. দুরে দুরে রোপন করা যেতে পারে। চারাগুলোকে কড়া রোদ ও অতিরিক্ত বৃষ্টি থেকে রক্ষাসহ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। শাখা কলম থেকে চারা উৎপাদন : শাখা কলম তৈরির জন্য জুলাই-আগষ্ট মাসের দিকে ৮-১০ সে.মি. দীর্ঘ করে অগ্রভাগ কেটে নিতে হবে। ২-৩টি নোড সম্পন্ন শাখা কলমের খন্ডগুলোকে তিনভাগ বালি ও একভাগ পাতা পচা সারের মিশ্রণে রোপন করতে হবে।

চারা রোপন

সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ২৫ সে.মি. চারা রোপন করতে হবে।

সারপ্রয়োগ

চন্দ্রমল্লিকার জন্য গোবর সার একর প্রতি ৪০০০ কেজি, ১৬০ কেজি ইউরিয়া, ১১০ কেজি টি এসপি ১২০ কেজি এমপি, ৬৬ কেজি জিপসাম, ৪.৮ কেজি বরিক এসিড, ১.৬ কেজি জিঙ্ক অক্সাইড হারে প্রয়োগ করতে হবে (বারি, ২০০৪)। শেষ চাষের সময় সমুদয় সার মাটির দুই কিস্তিতে ভাগ করে একভাগ রোপনের ২৫-৩০ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ৪৫-৫৯ দিন পর গোড়ার চারপাশে দিতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দিতে হবে।

কুড়ি অপসারণ

বর্ষাকালে প্রথম দিকে যখন শাখা বের হতে থাকে তখন মুল কান্ডের মাথা কেটে দিতে হবে। এরপর শাখা বের হলে প্রয়োজনীয় শাখা রেখে বাকি শাখা কেটে দিতে হয়। এতে ফুলের সংখ্যা বাড়ানো যায়। শাখাগুলির অগ্রভাগের ফুলের কুড়ি রেখে বাকিগুলো ফেলে দিতে হবে। এর ফলে বড় আকারের ফুল পাওয়া যায়।

ঠেক দেওয়া

চন্দ্রমল্লিকার গাছ যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য ঠেক দেয়া প্রয়োজন।

রোগ ও পোকা দমন : চন্দ্রমল্লিকার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা হল জাবপোকা। এ পোকা কচি পাতা, ফুলের রস খেয়ে ফেলে। এই পোকা ১ লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। থ্রিপস পোকাও পাতা ও ফুলের রস চুষে খায় ফলে পাতা ও ফুল শুকিয়ে যায়। চন্দ্রমল্লিকা পাউডারি মিলডিউ নামক ছত্রাক জনিত রোগের প্রার্দূভাব দেখা যায়। এ রোগ হলে পাতার উপর সাদা সাদা পাউডার দেখা যায়। এটি দমনের জন্য রিডোমিল ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে টিল্ট ২৫০ ইসি ৭-১০ দিন পর পর প্রয়োগ করলে রোগ দমন হয়।

ফুল সংগ্রহ

চারা লাগানোর ১০০-১২৫ দিনের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকার ফুল ফোটে। বাংলাদেশে নভেম্বর-জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এ ফুল ফোটে। চন্দ্রমল্লিকা ফুল কুড়ি অবস্থায় না তুলে বাইরে পাপড়িগুলো সম্পূর্ণ খুলে গেলে এবং মাঝের পাপড়িগুলো ফুটতে শুরু করলে দীর্ঘ বোঁটা সহ ছুরি দিয়ে কেটে আনতে হবে। চন্দ্রমল্লিকার ফুল অনেক দিন পর্যন্ত তাজা থাকে। ফুল সংগ্রহের পর বাজারে পাঠানোর আগ পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	চন্দ্রমল্লিকার চাষ পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

চন্দ্রমল্লিকা বিশ্বব্যাপী গোলাপের পরেই এর স্থান। চীন ও জাপান এর উৎপত্তিস্থল। চন্দ্রমল্লিকাকে জাতভেদে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। চন্দ্রমল্লিকার চারা সাধারণত: বীজ, সাকার ও শাখা কলমের মাধ্যমে করা হয়। চন্দ্রমল্লিকার ক্ষতিকর পোকা হল জাব পোকা। চারা লাগানোর ১০০-১২৫ দিনের মধ্যে ফুল ফোঁটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন ফুলকে শরতের রাণী বা Autumn queen বলা হয়?
ক) গোলাপ খ) ডালিয়া
গ) চন্দ্রমল্লিকা ঘ) গাঁদা

২। চন্দ্রমল্লিকা গছের গোড়া থেকে যে চারা বের হয় তাকে কী বলে?
ক) সাকার খ) কন্দমুল
গ) বাল্ব ঘ) কন্দ

৩। চন্দ্রমল্লিকার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা কোনটি?
ক) গুবরে পোকা খ) লেডি বার্ড বিটল
গ) জাবপোকা ঘ) মাছি

পাঠ-৮.৭ পিঁয়াজ চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পিঁয়াজের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি, জাত ও বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পিঁয়াজের জলবায়ুগত চাহিদা ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পিঁয়াজের চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মসলা জাতীয় ফসল, দ্বিবর্ষজীবী, শল্ককন্দ, বারি পিঁয়াজ, ক্যাপসুল

পিঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত মসলা জাতীয় ফসল। সবজি ও সালাদ হিসেবে এবং আচার, কেচাপ ও সস তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এর অনেক ওষধি গুণ রয়েছে। ক্ষত প্রতিষেধক হিসেবে এবং সর্দি-কাশি, আমাশয়, উচ্চ রক্তচাপ, পেটফাঁপা ইত্যাদি নিরাময়ে পিঁয়াজ ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি

পিঁয়াজ একটি দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ। তবে আমাদের দেশে এর একবর্ষজীবী জাতও দেখা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Allium cepa*. পিঁয়াজের রূপান্তরিত কান্ড সংলগ্ন পাতার গোড়ায় খাদ্য জমাটের ফলে স্ফীত হয় এবং কান্ডের সাথে একটির পর একটি সংযোজিত হয়ে শল্ককন্দ উৎপাদন করে। এ শল্ককন্দ পিঁয়াজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে নতুন গাছ জন্মে থাকে। পিঁয়াজের ফুল উভলিঙ্গী ,ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং বীজের রং কালো।

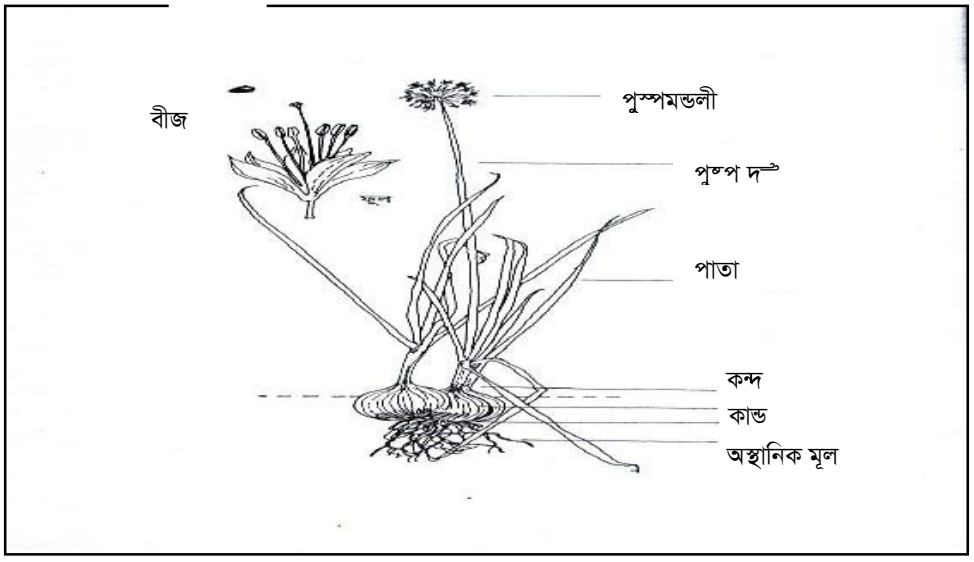

চিত্র ৮.৭.১ : (ক) পিঁয়াজের ফুলসহ গাছ

জাত

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতের পিঁয়াজ দেখা যায়। পিঁয়াজ আকার, আকৃতি, রং, ঝাঁঝ, বাণিজ্যিক ব্যবহার ও পরিকপক্কতার সময় অনুসারে বিভিন্ন রকম হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি পিঁয়াজ-১, ২ এবং ৩ নামে পিঁয়াজের তিনটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। এদের মধ্যে বারি পিঁয়াজ-১ শীতকালে এবং বারি পিঁয়াজ-২ ও ৩

গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী। পিঁয়াজের স্থানীয় জাতের মধ্যে তাহেরপুরী, ফরিদপুর ভাটি, কৈলাশনগর অন্যতম।

বংশবিস্তার

বীজতলায় চারা উৎপাদন করে জমিতে রোপণ, সরাসরি ক্ষেতে বীজ বপন বা ছোট ছোট কন্দ রোপণ সাধারণত এ তিনটি পদ্ধতিতে পিঁয়াজের চাষ করা হয়। এদের মধ্যে চারা রোপণ পদ্ধতিতে পিঁয়াজের ফলন বেশী হয়।

জলবায়ু ও মাটি

সহনশীল তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত দিনের আলো ও মাটিতে রস থাকলে পিঁয়াজের ভাল ফলন পাওয়া যায়। এঁটেল মাটি ছাড়া অন্য যে কোন মাটিতে পিঁয়াজের চাষ করা যায়। তবে দোঁআশ ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটি পিঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম। পিঁয়াজের ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। মাটির অম্লত্ব বা pH ৫.৮-৬.৫ পিঁয়াজ উৎপাদনের জন্য উত্তম, অধিক ক্ষার বা অম্ল মাটিতে পিঁয়াজের আকার ছোট হয় ও পুষ্ট হতে বেশী সময় লাগে।

উৎপাদন মৌসুম

বাংলাদেশে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অর্থাৎ সারা বছরই পিঁয়াজ চাষ করা সম্ভব। শীতকালীন পিঁয়াজ অক্টোবর থেকে জানুয়ারী, গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজ ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই এবং বর্ষাকালীন পিঁয়াজ জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে চাষ করা যায়।

জীবনকাল

চারা রোপণের ৯০ থেকে ১০৫ দিন পর পিঁয়াজ তোলার উপযুক্ত হয়।

বীজতলা

বীজতলা ৩ মি. × ১ মি. মাপের এবং ১৫-২০ সেমি. উঁচু হতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে চারা রোপণের জন্য ৩ মি. × ১ মি. আকারের ১২০-১৩০ টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। প্রখর সূর্যের তাপ এবং ভারী বৃষ্টিপাতের হাত থেকে বীজতলার বীজ ও চারা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শেডের ব্যবস্থা করতে হয়। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য বীজতলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নালার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

বীজ বপন

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পিঁয়াজ চাষের জন্য যথাক্রমে অক্টোবর থেকে নভেম্বর, ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ এবং জুন থেকে জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয। ৩ মি. × ১ মি. মাপের একটি বীজতলায় ২৫-৩০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম ভিটাভেক্স দ্বারা শোধন করে বীজবাহিত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

বীজের হার

প্রতি হেক্টর জমিতে চাষের জন্য চারা রোপণ পদ্ধতিতে ৩-৪ কেজি বীজ, সরাসরি ক্ষেতে বীজ বপন পদ্ধতিতে ৬-৭ কেজি বীজ এবং শল্ককন্দ (পিঁয়াজ) রোপণ পদ্ধতিতে কন্দের আকার অনুযায়ী প্রায় ১.২-১.৫ টন শল্ককন্দের (পিঁয়াজের) প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি

৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে, মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ও সমতল করে জমি তৈরি করতে হয়। সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার্থে জমিতে মাঝে মাঝে ৫০ সেমি. প্রশস্ত নালা রাখতে হয়।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের সঠিক মাত্রা মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। মধ্যম উর্বর জমিতে পিঁয়াজ চাষের জন্য হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নরূপ–

সারণী ১: পিঁয়াজ চাষে হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

সারের নাম	মোট পরিমাণ	জমি শেষ চাষের সময়	রোপণের ২৫ দিন পর	রোপণের ৫০ দিন পর
পচা গোবর	১০ টন	১০ টন	-	-
ইউরিয়া	২৬০ কেজি	১৩০ কেজি	৬৫ কেজি	৬৫ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি	২০০ কেজি	-	-
এমপি	১৬০ কেজি	৮০ কেজি	৪০ কেজি	৪০ কেজি
জিপসাম	১০০ কেজি	১০০ কেজি	-	-

মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সারের উপরিপ্রয়োগের পর জমিতে প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে।

চারা/কন্দ রোপণ

৪৫-৫০ দিন বয়সের পিঁয়াজের চারা ১৫×১০ সেমি দুরত্বে রোপণ করা হয়। উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সুস্থ ও সবল চারা রোপণ করা উচিত। চারা রোপণের গভীরতা ৩-৪ সেমি এবং একটি করে চারা লাগাতে হবে। কন্দ রোপণ পদ্ধতিতে সমতল জমিতে অগভীর নালা করে ২০-২৫ সেমি দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ১০-১৫ সেমি অন্তর কন্দ লাগানো হয়। চারা বা কন্দ রোপনের পরই সেচ দেওয়া আবশ্যক।

রোগবালাই ও পোকামাকড়

পেঁয়াজের প্রধান রোগগুলোর মধ্যে পার্পল ব্লেচ, লিফ ব্লাইট, অ্যানথ্রাকনোজ, বালব রট প্রধান। পার্পল ব্লেচ রোগ বীজবাহিত। সুতরাং বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে। পেঁয়াজের ক্ষতিকর পোকামাকড় হচ্ছে থ্রিপস, মাছি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ডায়াজিনন স্প্রে করতে হবে।

আগাছা দমন

জমি নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এতে কন্দ ভালভাবে গঠিত হয় ও ফলন বাড়ে।

সেচ ও নিকাশ

মাটির রস স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে পিঁয়াজের ফলন কমতে থাকে। এজন্য পিঁয়াজের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ৩ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। কন্দ গঠিত হয়ে গেলে সেচ কম লাগে। পিঁয়াজ উত্তোলনের ৩ সপ্তাহ পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ রাখতে হয় নতুবা পিঁয়াজের গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। সেচ প্রয়োগের ৩০-৬০ মিনিট পর সেচের অতিরিক্ত পানি নালা দিয়ে বের করে দিতে হবে। পিঁয়াজের সম্পূর্ণ জীবন চক্রে ৮-১০ বার সেচের প্রয়োজন হয়। সেচের পর জমিতে চটা বাঁধলে তাতে গাছের মূলে বাতাস চলাচল ব্যহত হয়। এজন্য চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। পিঁয়াজ মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এজন্য জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

প্রতিবার পিঁয়াজ ক্ষেতে নিড়ানির পর ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হয়। পিঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফুলের কলি বের হওয়ার সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, গ্রেডিং ও সংরক্ষণ

পিঁয়াজ গাছ পরিপক্ক হলে এর পাতা হেলে পড়ে। যখন ৭০-৮০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে নেতিয়ে বা ভেঙ্গে পড়ে তখন পিঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। উজ্জ্বল রৌদ্রযুক্ত দিনে পিঁয়াজ উত্তোলন করলে সংরক্ষণ ভাল হয়। পিঁয়াজ উত্তোলনের পর এর পাতা ও শিকড় কেটে বায়ু চলালচল সুবিধাযুক্ত শীতল ও ছায়াময় ঘরের মেঝেতে ৮-১০ সেমি উঁচু করে ৮-১০ দিন ছড়িয়ে রেখে দিলে পিঁয়াজ শুকিয়ে যায়।

আকারের উপর ভিত্তি করে পিঁয়াজকে মোটামুটি ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ক) ৪-১০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট বড় আকারের পিঁয়াজ

খ) ৩-৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট মাঝারী আকারের পিঁয়াজ
গ) ৩ সেমি এর কম ব্যাস বিশিষ্ট ছোট আকারের পিঁয়াজ
সুস্থ ও সবল পিঁয়াজ বাছাই ও গ্রেডিং করার পর বাঁশের মাচা, ঘরের সিলিং, প্লাস্টিক বা বাঁশের তাক অথবা ঘরের পাকা মেঝেতে শুষ্ক ও বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে পিঁয়াজ ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা যায়। মাঝে মাঝে পচা ও অঙ্কুরিত পিঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয়। কোল্ড স্টোরেজে ৭-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৬২-৬৭% আর্দ্রতায় পিঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। পচা ও অঙ্কুরিত পিয়াজ সরিয়ে ফেলতে হবে।

ফলন
আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরন করে পিঁয়াজের হেক্টরপ্রতি ১০-১৩ টন ফলন পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পিঁয়াজের জাত ও বংশবিস্তার এবং চাষাবাদ পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারাংশ

পিঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা জাতীয় ফসল। এটি একটি দ্বিবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর শল্ককন্দ ফসল ও বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া পিঁয়াজের আসল বীজ থেকেও চারা উৎপাদন করে পিঁয়াজের চাষ করা হয়। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পিঁয়াজ চাষের জন্য যথাক্রমে অক্টোবর থেকে নভেম্বর, ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ এবং জুন থেকে জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয। ৪০-৫০ দিন বয়সের পিঁয়াজের চারা ১৫×১০ সেমি দুরত্বে রোপণ করা হয়। কন্দ রোপণ পদ্ধতিতে ২০-২৫ সেমি দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ১০-১৫ সেমি অন্তর কন্দ লাগানো হয়। জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। পিঁয়াজ উত্তোলনের ৩ সপ্তাহ পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ রাখতে হয়। পিঁয়াজ ক্ষেতে নিড়ানির পর ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হয়। পিঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফুলের কলি দেখা যাওয়া মাত্রই ভেঙ্গে দিতে হবে। যখন ৭০-৮০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে নেতিয়ে বা ভেঙ্গে পড়ে তখন পিঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। শুষ্ক ও বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে পিঁয়াজ ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা যায়। কোল্ড স্টোরেজে পিঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। পিঁয়াজের হেক্টরপ্রতি ১০-১৩ টন ফলন পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত দিন বয়সের পিঁয়াজের চারা রোপণ করা উচিত?
ক) ৪৫-৫০ দিন খ) ৫০-৬০ দিন
গ) ৬০ দিনের বেশি।

২। পিঁয়াজ উত্তোলনের কমপক্ষে কত দিন পূর্বে সেচ বন্ধ করা উচিত?
ক) ২ সপ্তাহ খ) ৩ সপ্তাহ
গ) ৪ সপ্তাহ ঘ) ৫ সপ্তাহ।

৩। কখন পিঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়?
ক) ৫০-৬০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে গেলে
খ) ৬০-৭০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে গেলে
গ) ৭০-৮০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে গেলে

৪। প্রতি হেক্টর জমিতে পিঁয়াজ চাষের জন্য কি পরিমাণ শল্ক কন্দের প্রয়োজন হয়?
ক) ১.২-১.৫ টন খ) ১.৮-২.০ টন
গ) ২.২-২.৪ টন

পাঠ-৮.৮ রসুন চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রসুনের জাত, বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- রসুনের জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- রসুনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মসলা, ঔষধি গুণ, কন্দ, মালচিং, থ্রিপস পোকা, পার্পল ব্লচ।

রসুন একটি গুরুত্বপর্ণ মসলাজাতীয় ফসল। রসুনের অনেক ঔষধিগুণ রয়েছে। এটি মাংস, তরকারি, আচার, চাটনি, স্যুপ ও সস তৈরিতে ব্যবহার হয়। এছাড়াও ইনসেকটিসাইড, এন্টিব্যাকটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার হয়। রসুন পেটের পীড়া, আমাশয়, হৃদরোগ ও মানুষের শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে বিশেষ উপকারী।

জলবায়ু ও মাটি

বাংলাদেশে রসুন সাধারণত: শীতকালে চাষাবাদ করা হয়। রসুনের জন্য ঠান্ডা ও কুয়াশা মুক্ত এবং প্রচুর সূর্যালোক প্রয়োজন। বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে ১৫° সে. এর নীচে তাপমাত্রা না হলে গাছের কন্দ উৎপাদনে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে বাল্ব বা কন্দ বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিবস ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। উর্বর দোআঁশ মাটি রসুন চাষের জন্য উপযোগী। এঁটেল মাটি, অধিক অম্লীয় ও ক্ষার মাটি রসুন চাষের জন্য উপযুক্ত নয়।

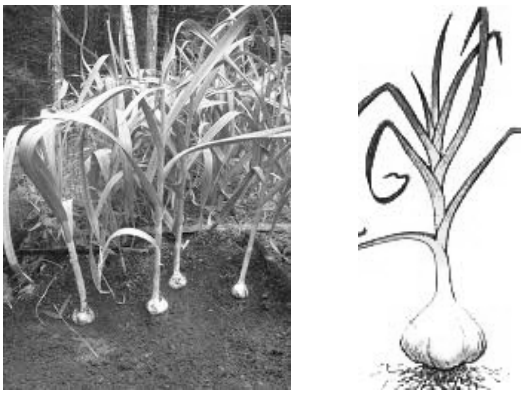

চিত্র ৮.৮.১ : রসুন গাছ

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরির জন্য ৫-৭ টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। জমিকে খন্ডে ভাগ করে নিতে হবে। খন্ডের মাঝে পানি অপসারনের জন্য নালা তৈরি করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হয়। রসুনের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে ৫-১০ টন গোবর/ কম্পোস্ট, ২৫০-৩০০ কেজি ইউরিয়া, টিএসপি ২০০-২৫০ কেজি, এমপি ৩০০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। জমি প্রস্তুতের সময় অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ গোবর, অর্ধেক টিএসপি, সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া দুই কিস্তিতে সমানভাগে চারা লাগানোর ৩৫ দিন এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। বোরাক্স ও জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করলে রসুনের ফলন ভালো হয়।

বীজ হার

বীজের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৩০০-৪০০ কেজি রসুনের কোয়া প্রয়োজন হতে পারে। রসুনের উৎকৃষ্ট, বড়, পোকামাকড় ও রোগজীবাণুমুক্ত কন্দ বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তবে মোটামুটি ১ গ্রাম ওজনের কোয়া হলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

রোপন পদ্ধতি

দুই পদ্ধতিতে রসুন রোপন করা যায়।

ক) ডিবলি পদ্ধতি : এক্ষেত্রে নরম মাটিতে বা জমিতে সুতা দ্বারা লাইন করে রসুনের কোয়া মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

খ) ফারো পদ্ধতি : সুনিষ্কাশিত উর্বর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটিতে লাঙ্গল দ্বারা সোজা নালা করে ৩-৪ সে.মি. গভীরে কোয়া রোপন করা হয়। এটি রসুন চাষে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। রোপনের জন্য সারি থেকে সারি ১৫ সে.মি. এবং ৭-১০ সে.মি. দুরে দুরে কোয়া রোপন করা উচিত।

অন্তঃপরিচর্যা

রসুনের জন্য কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সাথে মাটি ঝুর ঝুরে করে গোড়ায় দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রসুনের গোড়ায় কোন ক্ষতি না হয়। জমিতে কুচুরিপানা বা ধানের খড় দ্বারা মালচিং করলে মাটির রস সংরক্ষিত থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে সেচের তেমন প্রয়োজন হবে না। জমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পরিমানমত ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। তবে রসুন সংগ্রহের এক মাস আগে সেচ বন্ধ করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

রসুনের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের মধ্যে থ্রিপস্ ও মাইট উল্লেখযোগ্য। থ্রিপস গাছের পাতা রস চুষে খেয়ে তার উপর লম্বা সাদা দাগ সৃষ্টি করে। পরে পাতার অগ্রভাগ বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়। পোকা দমনের জন্য ১০০০ লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ১ লিটার মিশিয়ে এক হেক্টর জমিতে স্প্রে করলে সহজেই এ রোগ দমন করা যায়।

গোড়া পঁচা, পার্পল ব্লচ ও পাতা ঝলসানো রোগ হতে পারে। রসুনের ক্ষেত্রে গোড়া পঁচা রোগ হলে গোড়ার অংশ পঁচে যায়। এক্ষেত্রে ডাইথেন এম ৪৫ বা পেনকোজেব রোগনাশক স্প্রে করতে হবে। পার্পল ব্লচ রোগ ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে। এক রোগের ফলে প্রথমে ছোট ছোট দাগ পড়ে এবং পরে বিস্তার লাভ করে। ছোট ছোট দাগগুলি একত্রিত হয়ে বড় বাদামি দাগ হয়ে পাতা শুকিয়ে যায়। এক্ষেত্রে ২ গ্রাম রোভরাল ৫০ কেজি ডাব্লিউপি ১ লিটার পানিতে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও কর্তন

রসুন গাছের পাতা বাদামি রং ধারণ করলে, পাতা ভেঙ্গে পড়লে, কন্দের বাইরের দিকে কোয়াগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠলে দুই কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যাবে তখন বুঝতে হবে যে ফসল তোলার সময় হয়েছে। বপনের ৪-৫ মাসের মধ্যে রসুন সংগ্রহের উপর্যুক্ত সময়। হাত দিয়ে গাছ টেনে তুলে মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করে ছায়াতে শুকাতে হবে।

রসুন সংরক্ষণ : রসুন ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর পর দেখা যাবে কন্দের উপরে গলা সরু ও সংকুচিত হয়, এই পরিবর্তনকে কিউরিং বলে। কিউরিং এর ফলে রসুন দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। আলো বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে কয়েকটি রসুন পাতা সহ এক সংগে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রসুন চাষের ফলে যে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তার উপর শিক্ষার্থী প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

রসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলাজাতীয় ফসল। একটি বহু ঔষধিগুন রয়েছে। প্রতি হেক্টরে ৩০০-৪০০ কেজি রসুনের কোয়া প্রয়োজন। মোটামুটি ১ গ্রাম ওজনের কোয়া প্রয়োজন। বপনের ৪-৫ মাসের মধ্যে রসুন সংগ্রহের সময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রসুন চাষের জন্য উত্তম পদ্ধতি কোনটি?

ক) ডিবলিং পদ্ধতি খ) ফারো পদ্ধতি

গ) ছিটানো পদ্ধতি ঘ) কোনটিই নয়

২। কোন পোকা রসুনের পাতার রস চুষে খেয়ে লম্বা সাদাদাগ সৃষ্টি করে-

ক) ফলের মাছি পোকা খ) থ্রিপস

গ) মাইটস ঘ) কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

৩। কত গ্রাম ওজনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

ক) ১ গ্রাম খ) ২ গ্রাম

গ) ৩ গ্রাম ঘ) ৪ গ্রাম

পাঠ-৮.৯ আদা চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আদার জাত ও বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আদার জলবায়ুগত চাহিদা ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আদার চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আদা, পিলাই তোলা, রাইজোম রট, পাতা ঝলসানো রোগ

আদা একটি প্রয়োজনীয় মসলা ফসল যা খাবারকে সুস্বাদু করে। আদা বাড়ির পাশে পতিত জমি, পাহাড়ে চাষাবাদ করা যায়। বিভিন্ন ফসলের সাথে আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা যায়। আদার বিভিন্ন ঔষধিগুণ রয়েছে যেমন : পেটের পীড়া, আমাশয়, সর্দি কাশি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

জাত : বাংলাদেশে আদার তেমন জাত নেই। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি আদা-১ নামে একটি উফসী জাত রয়েছে। কৃষকরা সাধারণত স্থানীয় জাত চাষ করে থাকে।

চিত্র ৮.৯.১ : আদার কন্দসহ গাছ

জলবায়ু ও মাটি

আদার বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া উপযোগী। আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও আদার চাষ ভালো হয়। আদার জন্য সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ মাটিতে ভালো ফলন হয়। তবে এটেল দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

আদার জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে জমি গভীরভাবে ৫-৬ টি চাষ দিতে হবে। আগাছা বা আবর্জনা পরিষ্কার করে মাটি ঝুর ঝুরে করে সমতল করে নিতে হবে। আদার জন্য গোবর সার ১০ টন, ইউরিয়া ২৫০-৪০০ কেজি, টি এসপি ১৫০-১৮০ কেজি, এমপি ১৬০-১৮০ কেজি হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরি সময় গোবর সার, টিএসপি, অর্ধেক এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক এমপি সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পর এবং ২য় কিস্তি ৯০-১০০ দিন পর এবং বাকিটুকু ১২০-১৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

রোপন পদ্ধতি

আদার ১-২ কুঁড়ি বিশিষ্ট কন্দ মার্চ থেকে মে মাসে রোপন করতে হবে। সাধারণত ১৫-২০ গ্রাম ওজনের কন্দ প্রতি গর্তে ১টি করে ৪০-৫০ সে.মি. সারি থেকে সারি, গাছ থেকে গাছে ২৫ সে.মি. দূরত্বে ৫ সে.মি. গভীরে রোপন করতে হবে। বীজ রোপনের পর ঝুর ঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আদা রোপনের পর গাছ ও শিকড় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে মাতৃ আদা তুলে নিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না বরং আর্থিক লাভবান হওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে পিলাই তোলা বলে।

আন্তঃপরিচর্যা

আদার জমি আগাছামুক্ত থাকা প্রয়োজন। আগাছা পরিষ্কার করার সময় মাটি ঝুর ঝুর করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে এবং সারে উপরি প্রয়োগও একসাথে করতে হবে। আদার জমিতে ১৫ দিন পরপর সেচ দেওয়া ভালো। তবে অতিরিক্ত পানি যাতে না দাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আদার সাথে অন্যান্য ফসল অথবা ফলজ বৃক্ষ যেমন নারিকেল, সুপারি, কাঠাল বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা যায়।

রোগ ও পোকা মাকড় দমন

কন্দ পচন বা রাইজোম রট রোগ আদার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ব্যাভিস্টিন বীজ কন্দ দিয়ে শোধন করে ও শুকিয়ে জমিতে লাগাতে হবে। একই জমিতে বার বার আদার চাষ না করা ভালো।

বর্ষার শুরুতে পাতা ঝলসানো রোগ দেখা যায়। প্রথমে পাতায় ডিম্বাকৃতি ফ্যাকাসে দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে দাগগুলি একত্রিত হয়ে বিস্তার লাভ করে এবং পাতা শুকিয়ে যায়। ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্রাম এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আদার পোকা মাকড়ের মধ্যে কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে সঠিক কীটনাশক প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ

আদা লাগানোর ৭-১০ মাস পর পাতা ও গাছ হলুদ হয়ে শুকিয়ে গেলে ফসল তোলার উপযোগী হয়। সাধারত: ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে আদা তোলা হয়। আদা তুলে শিকড় ও মাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে তারপর শীতল ও আলো পূর্ণ এলাকায় আদা সংরক্ষণ করতে হবে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-৩০ টন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ শিক্ষার্থীরা আদা রোপন পদ্ধতি ও মাতৃ আদা তোলার কৌশল মাঠে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করবে

সারাংশ

আদা খাবার সুস্বাদুকারী মসলা জাতীয় ফসল। এর বহু ঔষধিগুণ ও রয়েছে। আদার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া উপযোগী। আদা মার্চ-এপ্রিল মাসে বপন করতে হয়। আদার গাছ বৃদ্ধি পেলে মাতৃ আদা তুলে নেয়া যায়। একে পিলাই তোলা বলে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-৩০ টন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আদা কোন মাসে লাগানো হয়?

ক) জুন-জুলাই খ) ডিসেম্বর-জানুয়ারি

গ) মার্চ-মে ঘ) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

২। পিলাই তোলা কি?

ক) মাতৃ আদা তুলে ফেলা খ) আদা রোপন করা

গ) আদার রোগ ঘ) আদার পোকা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সবুর মিয়া মানিকগঞ্জ তার এক আত্মীয় এর বাসায় বেড়াতে যান। সেখানে তিনি তার আত্মীয় এর পেয়ারার বাগান দেখেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেন এরপর তিনি ফিরে এসে ৫ বিঘা জমিতে যেখানে আগে আলু চাষ করতেন সেখানে পেয়ারা বাগান করলেন এবং সাথী ফসল হিসেবে আদা চাষ করলেন। এতে তার আগের তুলনায় অনেক লাভ হলো।

ক) ফল চাষের গুরুত্ব লিখুন।

খ) পেয়ারার জাত ও বংশবিস্তার উল্লেখ করুন।

গ) আদার চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

ঘ) ফল চাষ লাভজনক-উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ক ৫। গ ৬। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩ : ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪ : ১। খ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫ : ১। ক ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬ : ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮ : ১। খ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯ : ১। গ ২। ক